যক্ষ্মা ও কুষ্ঠ

নিয়মিত চিকিৎসাতে যক্ষ্মা ভালো হয়

আমাদের স্বপ্ন কুষ্ঠমুক্ত বাংলাদেশ

স্বাস্থ্য শিক্ষা ব্যুরো, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

সহযোগিতায়: পায়াক্ট বাংলাদেশ

যক্ষ্মা

যক্ষ্মা কি

যক্ষ্মা একটি জীবাণুঘটিত রোগ যা মাইকোব্যাকটেরিয়াম টিউবারকুলোসিস (যক্ষ্মা জীবাণু) নামক জীবাণু দিয়ে হাঁচি-কাশির মাধ্যমে সংক্রমণ হয়ে থাকে। যক্ষ্মা রোগ সংক্রমণের স্থান অনুযায়ী যক্ষ্মা দু'প্রকার। যেমন :

ক) Pulmonary TB বা ফুসফুসের যক্ষ্মা

খ) Extra- Pulmonary TB বা ফুসফুস বহির্ভূত যক্ষ্মা

তবে ফুসফুসে আক্রান্ত যক্ষ্মা রোগীর সংখ্যা সর্বাধিক, যা সমগ্র যক্ষ্মা রোগের ৮০% এর উর্ধ্বে। ফুসফুসের যক্ষ্মা দু'প্রকার। যথা :

Pulmonary smear positive TB বা ফুসফুসের যক্ষ্মা জীবাণুযুক্ত রোগী: যাদের কফে যক্ষ্মার জীবাণু পাওয়া যায়, এ ধরনের ফুসফুসের যক্ষ্মার মাধ্যমে রোগের সংক্রমণ ঘটে ও বিস্তার লাভ করে। সুতরাং যক্ষ্মা রোগের বিস্তার রোধ করতে এবং রোগীকে বাঁচাতে বিলম্ব না করে এ রোগের চিকিৎসা শুরু করা জরুরী।

Pulmonary smear negative TB বা ফুসফুসের যক্ষ্মা জীবাণুমুক্ত রোগী: যাদের কফে যক্ষ্মার জীবাণু পাওয়া যায় না অথচ ফুসফুসে যক্ষ্মা আছে এবং সুস্থ ব্যক্তির দেহে এ রোগ ছড়ায় না।

যক্ষ্মা রোগ কিভাবে ছড়ায়

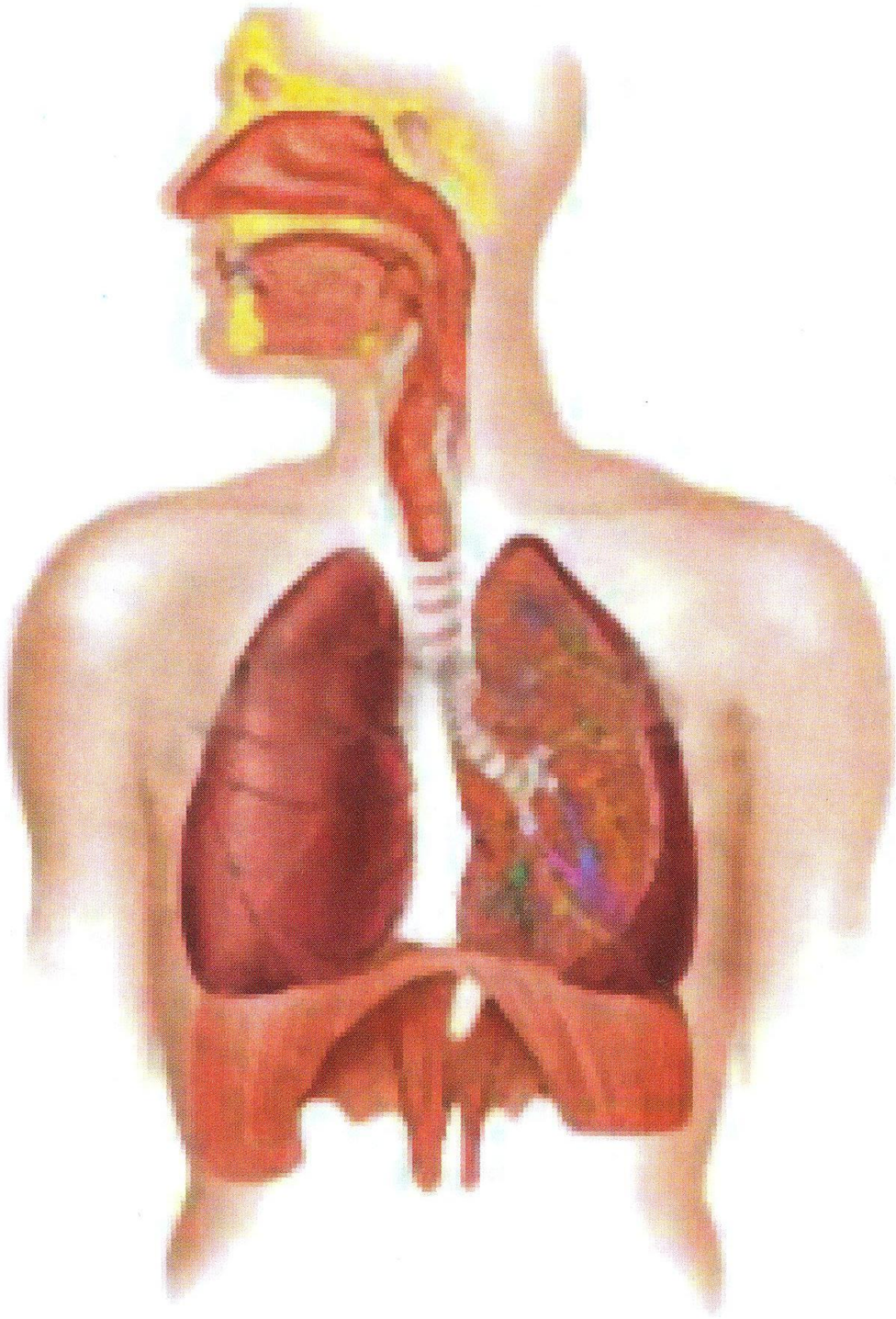

যক্ষ্মা রোগ কিভাবে ছড়ায়

যক্ষ্মা রোগীর কফ, হাঁচি-কাশির মাধ্যমে যক্ষ্মা রোগের জীবাণু বের হয়ে বাতাসে মিশে ও শ্বাস-প্রশ্বাসের মাধ্যমে তা সুস্থ ব্যক্তির ফুসফুসে ঢুকে বংশ বৃদ্ধি করে। একজন যক্ষ্মা রোগী চিকিৎসা ছাড়া বছরে দশজন সুস্থ লোককে আক্রান্ত করতে পারে। এভাবে সে তার পরিবারের সদস্য ও আশে পাশের ব্যক্তিদের মাঝে এ রোগ ছড়াতে পারে।

ফুসফুসে যক্ষ্মা রোগের লক্ষণ কি কি

- এক নাগাড়ে তিন সপ্তাহ বা তার অধিক সময় ধরে কাশি
- জ্বর, বুকে ব্যথা, খাবারে অরুচি, শ্বাস কষ্ট ও ওজন কমে যাওয়া
- সাধারণ এন্টিবাইওটিক দিয়ে এ কাশি নিরাময়যোগ্য নয়

কখন একজন ব্যক্তিকে যক্ষ্মা রোগী হিসেবে সন্দেহ করা যেতে পারে

কখন একজন ব্যক্তিকে যক্ষ্মা রোগী হিসেবে সন্দেহ করা যেতে পারে

নিম্নোক্ত লক্ষণগুলোর উপর ভিত্তি করে একজন ব্যক্তিকে যক্ষ্মা রোগী হিসেবে সন্দেহ করা যেতে পারেঃ

ক) তিন সপ্তাহ বা তার অধিক সময় ধরে কাশি (কাশির সাথে রক্ত থাকুক বা না থাকুক)

খ) কাশির সাথে জ্বর, বুকে ব্যথা, খাবারে অরুচি, শ্বাস কষ্ট,শরীর শুকিয়ে যাওয়া বা ওজন কমে যাওয়া

এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, উপরে বর্ণিত লক্ষণগুলোর মধ্যে শুধুমাত্র তিন সপ্তাহ বা তার অধিক সময় ধরে কাশি থাকলে কোন ব্যক্তিকে যক্ষ্মা রোগী বলে সন্দেহ করতে হবে এবং কফ্ পরীক্ষার জন্য নিকটস্থ উপজেলা হাসপাতালে/বক্ষব্যাধি ক্লিনিকে অথবা নির্দিষ্ট এনজিও ক্লিনিকে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা ও পরামর্শের জন্য প্রেরণ করতে হবে ।

যক্ষ্মা রোগ প্রতিরোধ

যক্ষ্মা রোগ প্রতিরোধ

যেহেতু যক্ষ্মা একটি সংক্রামক রোগ তাই এর প্রতিরোধ ব্যবস্থা জাতীয় যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচির একটি অপরিহার্য শর্ত। এ ক্ষেত্রে যে সকল পদক্ষেপসমূহ অনুসরণযোগ্যঃ

- রোগের সম্ভাব্য লক্ষণ দেখা দিলে উপ-সহকারী কমিউনিটি মেডিকেল অফিসার/কাউন্সিলর, স্বাস্থ্য সহকারী/স্বাস্থ্য কর্মীর পরামর্শ নেয়া
- রোগ সনাক্ত হলে অবিলম্বে চিকিৎসা শুরু করা এবং নিয়মিত, সঠিক মাত্রায়, ক্রমাগতভাবে ও পূর্ণ মেয়াদে ওষুধ সেবন করা
- রোগীর কফ্, থুথু নির্দিষ্ট পাত্রে ফেলা ও পরে তা পুঁতে ফেলা
- পরিবারের একজন রোগী হলে এবং পরিবারের অন্যদের যক্ষ্মা রোগের লক্ষণ থাকলে তাদের কফ্ পরীক্ষা করানো
- জন্মের পর পর শিশুকে বিসিজি টিকা দেয়া

যক্ষ্মার রোগের চিকিৎসা

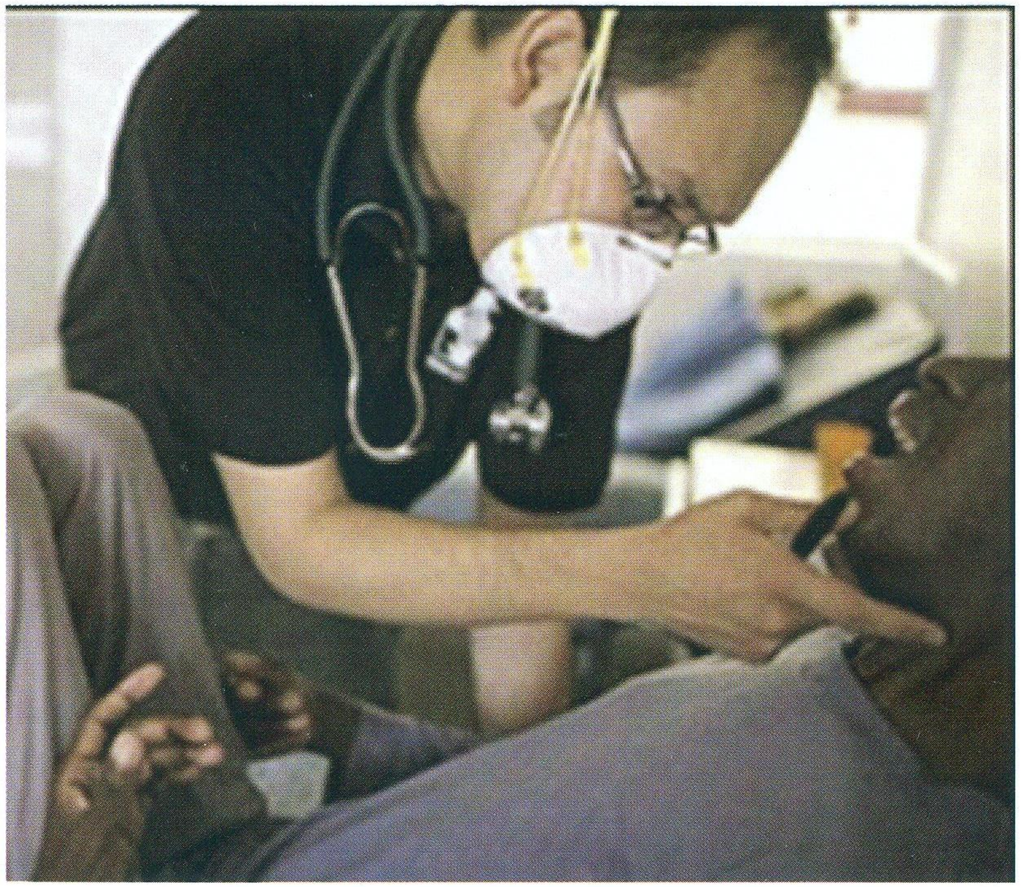

যক্ষ্মা রোগের চিকিৎসা

প্রতিটি জেলা হাসপাতাল, উপজেলা হাসপাতাল ও বক্ষব্যাধি ক্লিনিক এবং নির্দিষ্ট এনজিও ক্লিনিক-এ সম্পূর্ণ বিনামূল্যে যক্ষ্মা রোগের পরীক্ষা ও চিকিৎসা পাওয়া যায়। নিয়মিত, সঠিক মাত্রায়, ক্রমাগত ও নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত ওষুধ সেবনের মাধ্যমে যক্ষ্মা রোগ সম্পূর্ণভাবে ভালো হয়। অনিয়মিত, অপর্যাপ্ত এবং অসম্পূণ চিকিৎসায় যক্ষ্মা রোগ জটিল আকার ধারণ করে এবং পরবর্তীতে নিয়মিত ও পর্যাপ্ত চিকিৎসা করলেও যক্ষ্মা রোগ থেকে আরোগ্য লাভ করার সম্ভাবনা খুবই কম থাকে।

নিয়মিত, ক্রমাগত, সঠিক মাত্রায় এবং পূর্ণ মেয়াদে চিকিৎসা সম্পূর্ণ করলে যক্ষ্মা রোগ সম্পূর্ণ ভালো হয়। কিছুদিন চিকিৎসার পর সুস্থ বোধ করলে অনেক রোগী ওষুধ খাওয়া বন্ধ করে দেন, যা অত্যন্ত বিপদজ্জনক; কারণ অনিয়মিত চিকিৎসার ফলে ওষুধের কার্যকারিতা কমে বা একেবারে নষ্ট হয়ে যেতে পারে। ফলে ঐ রোগীর জন্য যক্ষ্মা রোগটি অনিরাময়যোগ্য এবং মৃত্যুর কারণও হতে পারে।

যক্ষ্মার ওষুধের সম্ভাব্য পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া ও হাসপাতালে রেফার

যক্ষ্মার ওষুধের সম্ভাব্য পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া ও হাসপাতালে রেফার

যক্ষ্মার ওষুধের সম্ভাব্য পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে রোগীকে ধারণা দেয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ সম্ভাব্য পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়ার কারণে রোগী ওষুধ সেবন বন্ধ করে দিতে পারেন। অপরদিকে ওষুধের পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়ার ক্ষেত্রে রোগী ডাক্তারের পরামর্শ অনুসরণে উৎসাহিত নাও হতে পারেন। যার কারণে শারীরিক অবস্থা জটিল আকার ধারণ করতে পারে। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া গুরুতর নয় এবং কোন চিকিৎসার প্রয়োজন হয় না, রোগীকে আশ্বস্ত করাই যথেষ্ট।

পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া গুরুতর আকার ধারণ করলে সাথে সাথে ওষুধ সেবন বন্ধ করে দিতে হবে এবং স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে।

কুষ্ঠরোগ

কুষ্ঠরোগ

কুষ্ঠ একটি দীর্ঘ মেয়াদী জীবাণুঘটিত মৃদু সংক্রামক রোগ যাতে মূলতঃ প্রান্তিক স্নায়ু আক্রান্ত হয় এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই চামড়ার মাধ্যমে এ রোগের বহিঃপ্রকাশ ঘটে ।

প্রান্তিক স্নায়ু ও ত্বক ছাড়াও এ রোগে অন্যান্য অঙ্গ যেমন নাকের শ্লেষ্মা ঝিল্লি (Mucous membrane), অস্থি (Bone) আক্রান্ত হয় এবং প্রান্তিক স্নায়ু ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার কারণে ঐ স্নায়ু কর্তৃক সরবরাহকৃত মাংশপেশী ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে অকার্যকর হয়ে পড়ে। একই কারণে চোখের পাতার মাংশপেশী ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার কারণে কুষ্ঠরোগীর দৃষ্টিশক্তি ক্ষতিগ্রস্থ হওয়া এমনকি পুরোপুরি অন্ধ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে ।

এ ছাড়াও কখনও কখনও বৃক্ক (Kidney) এবং পুরুষ রোগীদের ক্ষেত্রে অন্ডকোষ (Testes) এ রোগে আক্রান্ত হতে পারে ।

কুষ্ঠ রোগের কারণ ও বিস্তার

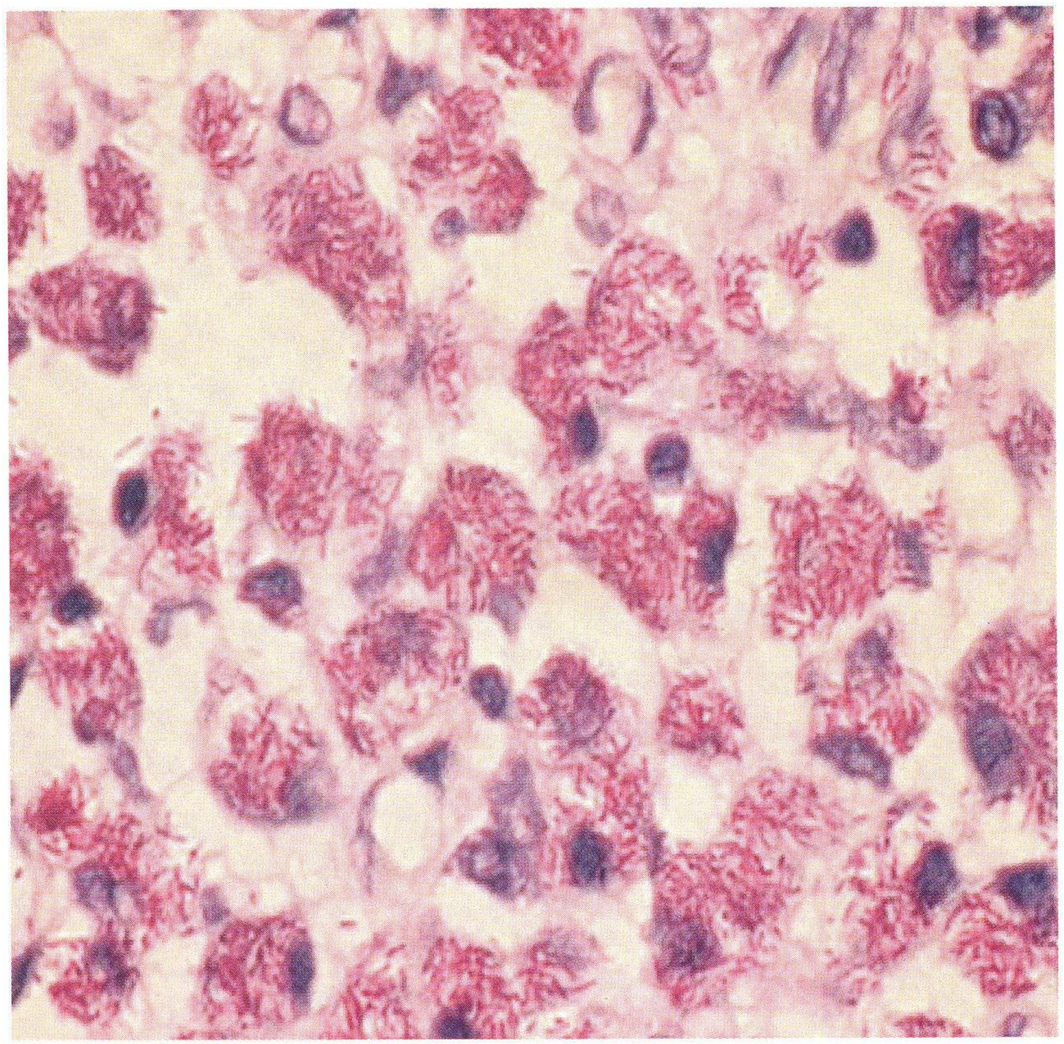

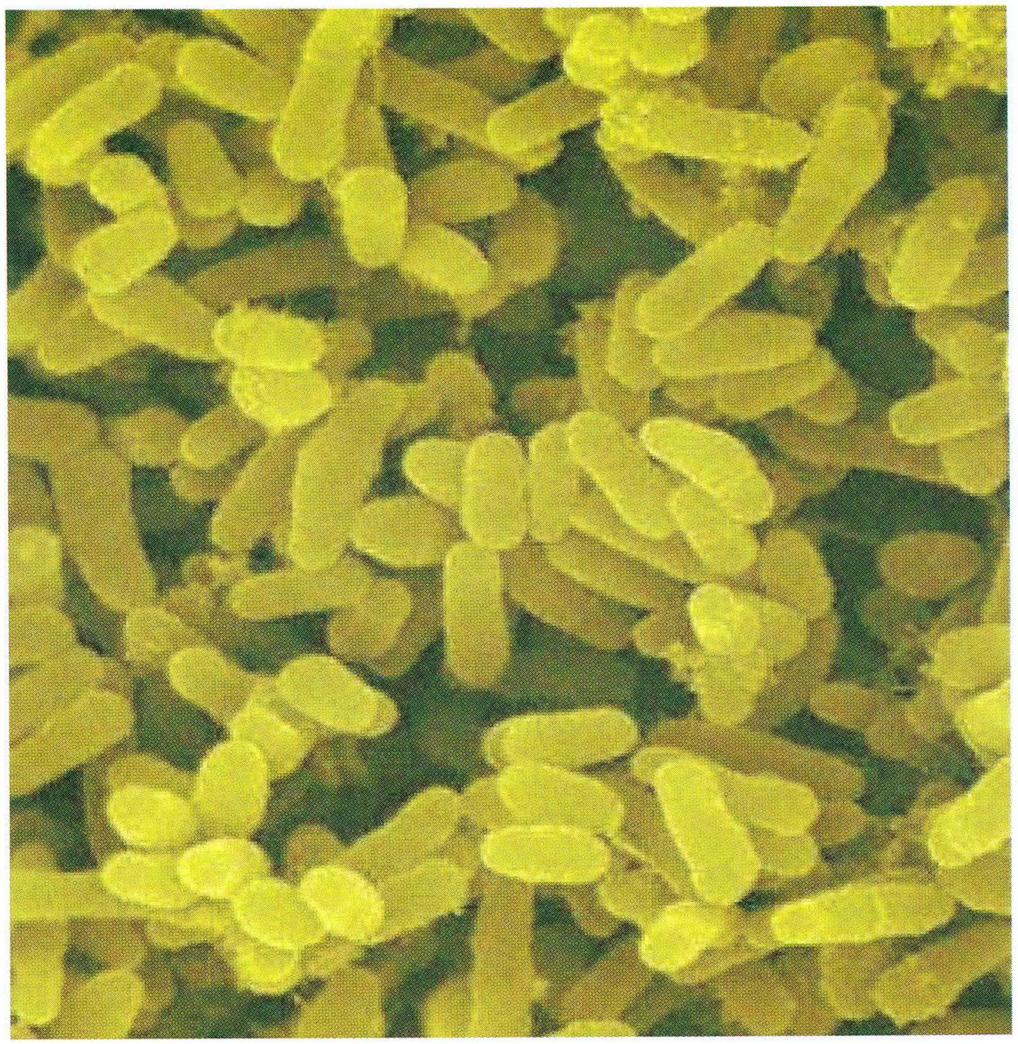

মাইকোব্যাক্টেরিয়াম লেপ্রি ভাইরাস

কুষ্ঠ রোগের কারণ ও বিস্তার

জীবাণু দিয়ে কুষ্ঠরোগ হয়। এ জীবাণুর নাম মাইকোব্যাক্টেরিয়াম লেপ্রি (Mycobacterium leprae)।

কুষ্ঠ জীবাণুর বংশ বিস্তার

কুষ্ঠরোগের জীবাণু অত্যন্ত ধীরগতিতে বংশ বিস্তার করে। একটি কুষ্ঠ জীবাণু থেকে দু'টি কুষ্ঠ জীবাণুতে পরিণত হতে সাধারণতঃ ১২ থেকে ১৪ দিন সময় লাগে। এ সময়কে জেনারেশন টাইম (Generation time) বা ডাবলিং টাইম (Doubling time) বলা হয়।

কুষ্ঠরোগের সুপ্তিকাল

কুষ্ঠরোগের জীবাণু শরীরে অণুপ্রবেশের পর রোগের বহিঃপ্রকাশ হতে যে সময় লাগে তাকে কুষ্ঠরোগের সুপ্তিকাল বলে। এ সুপ্তিকাল সাধারণতঃ ২ থেকে ৫ বছর। তবে এ সুপ্তিকাল ৬ মাস হতে ৪০ বছর বা তারও অধিক সময় হতে পারে।

কুষ্ঠরোগের বিস্তার

মানুষকেই কুষ্ঠরোগের প্রধান উৎস হিসেবে বিবেচনা করা হয়। কুষ্ঠরোগের জীবাণু আছে এমন একজন সংক্রামক কুষ্ঠরোগীর হাঁচি, কাশির মাধ্যমে বের হয়ে বাতাসে মিশে নিঃশ্বাসের মাধ্যমে সুস্থ লোকের দেহে প্রবেশ করে। কিন্তু শতকরা প্রায় ৯৯ ভাগেরও বেশী লোকের শরীরে প্রকৃতি প্রদত্ত কুষ্ঠ বিরোধী প্রতিরোধ ক্ষমতা থাকার কারণে এ রোগে আক্রান্ত হয় না। উপরন্তু মোট কুষ্ঠরোগের মাত্র ১৫-২০% সংক্রামক, যারা পরিবেশে কুষ্ঠ জীবাণু ছড়ায় এবং বাকী ৮০-৮৫% অসংক্রামক যারা পরিবেশে কুষ্ঠরোগের জীবাণু ছড়াতে পারে না।

কুষ্ঠরোগের বহিঃপ্রকাশ

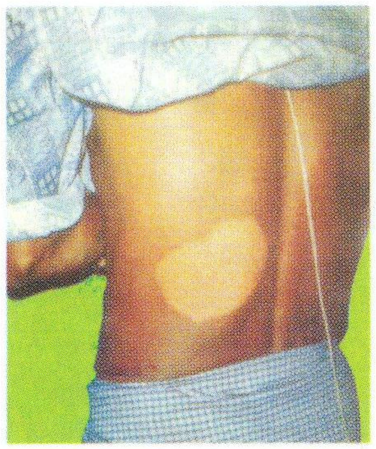

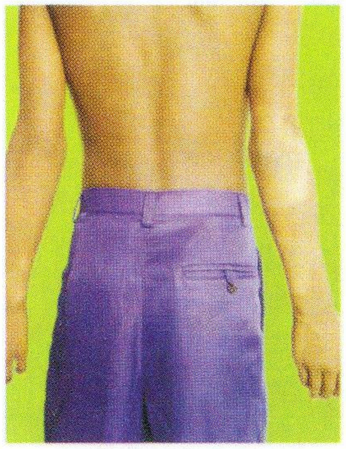

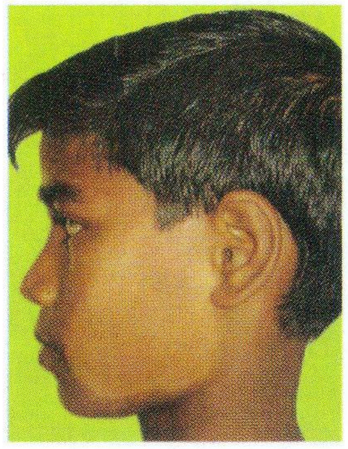

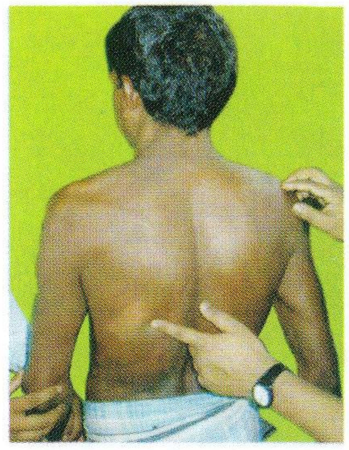

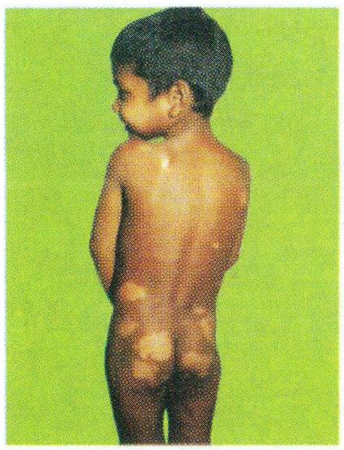

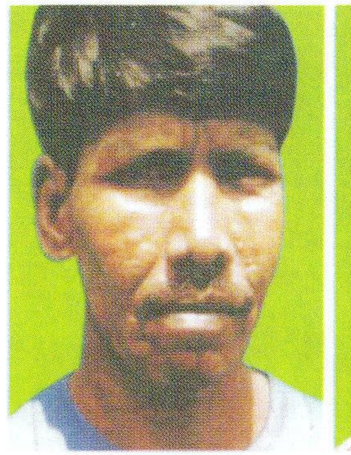

কুষ্ঠরোগের বহিঃপ্রকাশ

কুষ্ঠরোগ মূলতঃ প্রান্তিক স্নায়ুতন্ত্রের রোগ যদিও অধিকাংশ রোগীর ক্ষেত্রেই এর বহিঃপ্রকাশ ঘটে চামড়া বা ত্বকের মাধ্যমে ।

কোন লোকের নিঃশ্বাসের সংগে শরীরে প্রবেশকারী কুষ্ঠ জীবাণু রক্তের মাধ্যমে বাহিত হয়ে জীবাণু পছন্দ করে (শরীরের ঠান্ডা স্থানসমূহ যেমন-প্রান্তিক স্নায়ু ও ত্বক) এমন জায়গাতে গিয়ে পৌছে এবং সেখানে বংশ বিস্তার করে । কালক্রমে সে চামড়ায় বা স্নায়ুতে কুষ্ঠরোগের বহিঃপ্রকাশ ঘটায় ।

রোগের বহিঃপ্রকাশ যেভাবে ঘটে

- চামড়ায় ফ্যাকাশে বা লালচে দাগ দেখা যায় যাতে কোন অনুভূতি থাকে না, চুলকায় না, ঘামে না এবং ঐ স্থানের লোম পড়ে যায়
- কান, মুখমন্ডল বা শরীরের অন্যান্য স্থানে গুটি দেখা দেয়
- শরীরের বিভিন্ন প্রান্তিক স্নায়ু মোটা হয়ে যায় এবং সেই সংগে তাতে ব্যাথাও হতে পারে
- কখনও কখনও দাগ বা গুটির পরিবর্তে কোথাও কোথাও চামড়া মোটা হয়ে যায়
- কখনও কখনও মাংসপেশীর দূর্বলতা দেখা দেয় ও মাংসপেশী শুকিয়ে যায়

কুষ্ঠ রোগের লক্ষণ ও উপসর্গ

কুষ্ঠরোগের লক্ষণ ও উপসর্গ

অধিকাংশ জীবাণু টক্সিন বা এনজাইম তৈরী করে রোগের সৃষ্টি করে। কিন্তু জীবাণু এ ধরণের কোন টক্সিন বা এনজাইম তৈরী করে না। মানব শরীর কর্তৃক জীবাণুর প্রতি যে সাড়া (Response) বা সংবেদনশীলতা তাই কুষ্ঠরোগের লক্ষণাদি প্রকাশে প্রধান ভূমিকা রাখে।

কুষ্ঠরোগের লক্ষণ খুবই বিচিত্র। মানুষের সংক্রামক রোগগুলোর কোনটিতেই লক্ষণ প্রকাশের ক্ষেত্রে এত তারতম্য দেখা যায় না। কুষ্ঠরোগের লক্ষণাদি চামড়ায় সামান্য ফ্যাকাশে/লালচে দাগ থেকে শুরু করে প্রান্তিক স্নায়ুর ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্থতাসহ আভ্যন্তরীণ নানা অঙ্গের যেমন- চোখ, অস্থি, তরুণাস্থি, মাংসপেশী ও হাত-পায়ের ক্ষতি ও বিকৃতি এবং পঙ্গুত্ব দেখা দিতে পারে।

সাধারণতঃ কুষ্ঠরোগীদের তেমন কোন উপসর্গ থাকে না। কুষ্ঠরোগে মূলতঃ প্রান্তিক স্নায়ু আক্রান্ত হয় ; যদিও অধিকাংশ রোগীই ত্বক বা চামড়ায় লক্ষণাদি নিয়ে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হয়।

- রোগীর শরীরের চামড়ায় এক বা একাধিক ফ্যাকাশে বা লালচে দাগ দেখা দেয়
- প্রান্তিক স্নায়ু মোটা হওয়ার কারণে সংশ্লিষ্ট মাংশপেশীর দূর্বলতা কিংবা মাংশপেশী অকেজো হয়ে তার কার্যকারিতা লোপ পেতে পারে
- ত্বক বা চামড়ায় দাগ ছাড়াই হাত বা পায়ের কিছু অংশে অনুভূতি না থাকা, কিংবা মাংশপেশীর দূর্বলতা নিয়েও কিছু রোগী চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে পারে। এ ধরনের রোগীদের প্রাইমারী বা পিওর নিউরাইটিক কুষ্ঠরোগী বলা হয়
- কখনও কখনও রোগীরা কুষ্ঠ প্রতিক্রিয়াজনিত উপসর্গ নিয়ে চিকিৎসকের শরাণাপন্ন হয়। এ সকল উপসর্গের মধ্যে আছে চোখ ব্যথা ও চোখে ঝাপসা দেখা, অন্ডকোষে ব্যথা, ব্যথাযুক্ত লালচে চর্মগুটি, ব্যথাযুক্ত ও স্ফীত লসিকা গ্রন্থি, ব্যথাযুক্ত মাংসপেশী কিংবা ব্যথাযুক্ত অস্থিসন্ধি। কদাচিৎ অনুভূতিবিহীন হাত বা পায়ে ব্যথাহীন পোড়া দাগ বা ক্ষত নিয়ে রোগীরা চিকিৎসকের কাছে আসতে পারে

কুষ্ঠরোগের চিকিৎসা

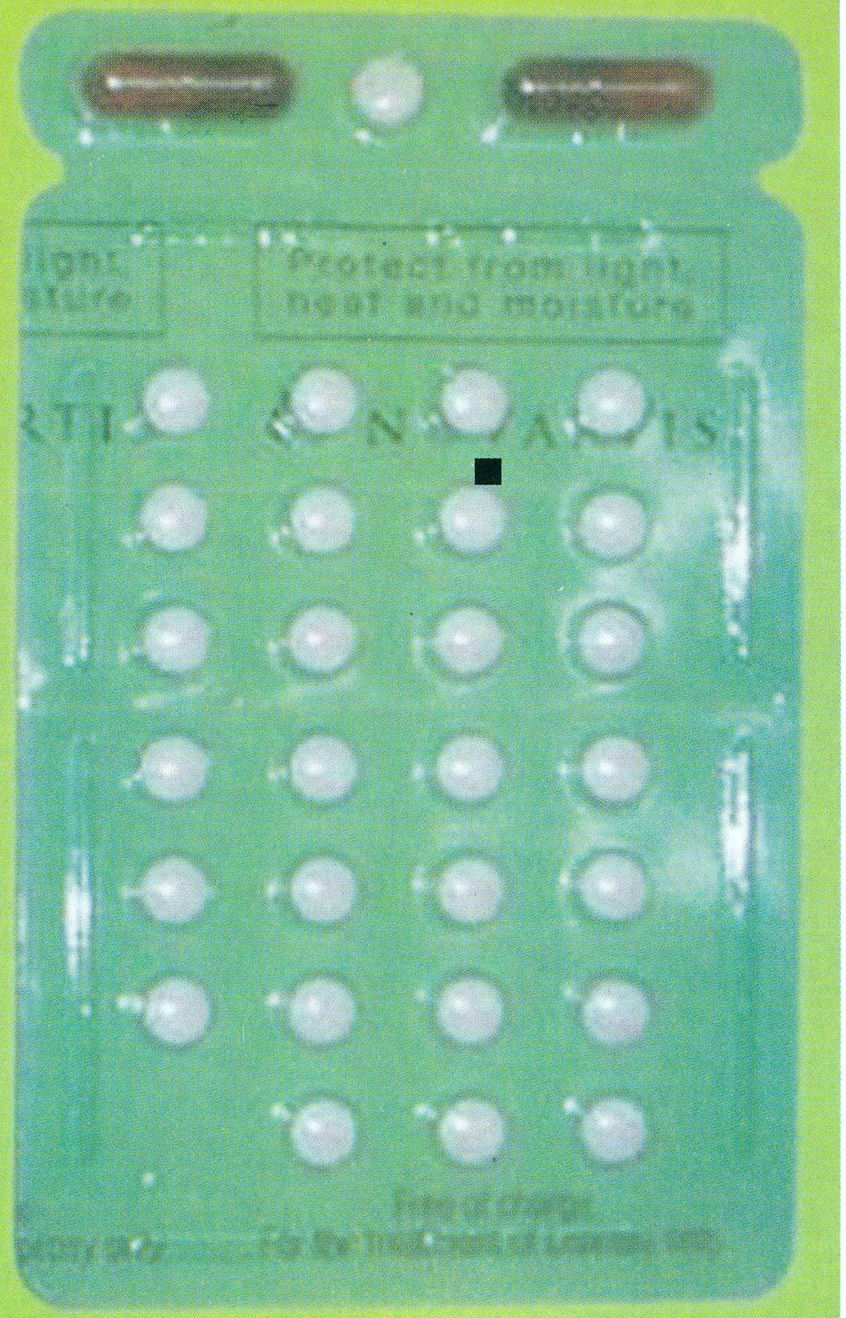

কুষ্ঠরোগের চিকিৎসা

কুষ্ঠরোগের আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থার নাম 'এম ডি টি (MDT)' বা 'মাল্টি ড্রাগস ট্রিটমেন্ট'। এ ব্যবস্থায় একাধিক ওষুধের সমন্বয়ে চিকিৎসা দেয়া হয়। পূর্বে একটি মাত্র ওষুধের সাহায্যে কুষ্ঠরোগের চিকিৎসা দেয়া হতো; তখন একে বলা হতো 'ড্যাপসন মনোথেরাপি'। মনোথেরাপি ব্যবস্থায় আজীবন ওষুধ খেতে হতো। বর্তমান ব্যবস্থায় নির্দিষ্ট মেয়াদে চিকিৎসা গ্রহণ করতে (ওষুধ খেতে) হয়।

চিকিৎসার জন্য কুষ্ঠরোগীকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়ঃ

১। পসিব্যাসিলারি লেপ্রসি (PBL)

২। মাল্টি-ব্যাসিলারি লেপ্রসি (MBL)

পসিব্যাসিলারি কুষ্ঠরোগীদের চিকিৎসার মেয়াদ নিয়মিত ৬ মাস এবং মাল্টি-ব্যাসিলারি কুষ্ঠরোগীদের চিকিৎসার মেয়াদ নিয়মিত ১২ মাস। তবে পসিব্যাসিলারি কুষ্ঠরোগী যদি ৯ মাসের মধ্যে ৬টি এবং মাল্টি-ব্যাসিলারি কুষ্ঠরোগী যদি ১৮ মাসের মধ্যে ১২টি এম ডি টি ব্লিস্টার প্যাকের ওষুধ গ্রহণ সম্পন্ন করতে পারেন তবেই তিনি সাফল্যের সঙ্গে কুষ্ঠরোগের চিকিৎসা সম্পন্ন করেছেন বলে গণ্য করা হবে।

পসিব্যাসিলারি রোগীদের ২টি এবং মাল্টি-ব্যাসিলারি রোগীদের ৩টি ওষুধের সমন্বয়ে চিকিৎসা দেয়া হয়। রিফামপিসিন ও ড্যাপসন সমন্বয়ে চিকিৎসাকে বলা হয় পসিব্যাসিলারি রেজিমেন (PBR) বা পি বি আর এবং রিফামপিসিন, ড্যাপসন ও ক্লোফাজেমি সমন্বয়ে চিকিৎসাকে বলা হয় মাল্টি-ব্যাসিলারি রেজিমেন (MBR) বা এম বি আর।
এম ডি টি নির্দ্দিষ্ট ও স্বল্প মেয়াদী চিকিৎসা ব্যবস্থা। এ ছাড়াও এ পদ্ধতির অনেক সুবিধা আছে।

- এটি কুষ্ঠ চিকিৎসায় অত্যন্ত কার্যকর ও নিরাপদ
- এটি রোগীদের কাছে বেশ গ্রহণযোগ্য
- মাঠ পর্যায়ে ব্যবহারের জন্যও এটি অত্যন্ত উপযোগী
- খুব স্বল্প সময়েই সংক্রামক কুষ্ঠরোগীকে অসংক্রামকে পরিণত করে
- পুন:সংক্রমণের হার খুবই সীমিত
- ওষুধ প্রতিরোধী জীবাণুর উদ্ভব প্রতিরোধে বেশ কার্যকর

সর্বোপরি কুষ্ঠরোগ নিরাময় এম ডি টি-র কার্যকারিতা সমাজে কুষ্ঠ বিষয়ক নেতিবাচক ধারণার আমূল পরিবর্তনে সহায়ক ভূমিকা রাখছে।

যক্ষ্মা মুক্ত নির্মল বায়ু চাই

স্বাস্থ্য শিক্ষা ব্যুরো, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

কৃতজ্ঞতায়: জাতীয় যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ও দি লেপ্রসি মিশন ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ